OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 196 - 203
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 196 - 203
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অনিল ঘড়াই-এর নির্বাচিত উপন্যাস : প্রান্তিক নারীর প্রতিবাদী চেতনার আখ্যান

আজিমুদ্দিন মন্ডল
গবেষক
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : suraj.jarur@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Femininity, Cruel oppression, Insensitive men, Enslaved, Subhuman, Marginal women, Patriarchal society, Individualistic.

Abstract
Femininity has been lost and oppressed for ages under the cruel oppression of insensitive men. Insensitive men have taken away women's right to become women and enslaved them. So, the female spends her entire life by changing the cage. Man is the master of woman in childhood, adolescence, youth, adulthood, and old age. And in the life of changing the cage, they did not have their own land, nor their own world. But women are never subhuman, their survival does not depend on the will or unwillingness of men. Being one of those who do not open their mouths even if their chests are broken by the oppression of the patriarchal society, but the marginal Women characters of Anil Gharai's novels 'Nunbari' (1989), 'Mukuler Gandha' (1990), 'Piyasharan' (2014) are locked in the prison of life. Didn't want to be. They rejected the basic idea of patriarchal society and wanted to establish themselves as independent existence. They are self-resplendent, individualistic and defiant women.

Discussion

অসংবেদনশীল পুরুষের নিষ্ঠুর নিপীড়নে নারীসত্তা যুগ যুগ ধরে ভূলুণ্ঠিত, অবদমিত। ছলে-বলে-কৌশলে অসংবেদনশীল পুরুষ নারীদের নারী হয়ে ওঠার অধিকার কেঁড়ে নিয়ে তাঁদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। তাই নারী তাঁর সমগ্র জীবন খাঁচা বদলের মাধ্যমেই অতিবাহিত করে থাকে। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে পুরুষই নারীর প্রভু। আর এই খাঁচা বদলের জীবনে না ছিল তাঁদের নিজস্ব জমি, না ছিল তাঁদের নিজস্ব ভুবন। কিন্তু নারী কখনই ঊনমানবী নয়, পুরুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপরে তাঁদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শত নিষ্পেষণে-নিপীড়নে যাঁদের বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না, তাঁদেরই একজন হয়ে কিন্তু আমাদের আলোচ্য অনিল ঘড়াই-এর ‘নুনবাড়ি’ (১৯৮৯), ‘মুকুলের গন্ধ’ (১৯৯০), ‘পিয়াসহরণ’ (২০১৪) উপন্যাসের প্রান্তিক নারী চরিত্ররা জীবনের বন্দিশালায় রুদ্ধ হয়ে থাকতে চায়নি। তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল ভাবনাকেই প্রত্যাখ্যান করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তাঁরা আত্মস্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিময়ী, ব্যক্তিত্বময়ী এবং প্রতিবাদিনী নারী।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 196 - 203
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জনদরদি কথাকার অনিল ঘড়াই-এর জন্ম ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার অন্তর্গত রুক্মিনীপুর নামক এক অখ্যাত গ্রামে। অনিল ঘড়াই-এর পিতার নাম অভিমন্যু ঘড়াই, মাতা তিলোত্তমা ঘড়াই। বাস্তবের চোখধাঁধানো বিলাসবহুল ভদ্র জীবনের পাশে যে স্যাঁতসেঁতে বস্তিজীবন আছে, যাঁদের আমরা দেখেও দেখি না; তাঁদের চোখ দিয়ে তাঁদেরই দেখতেন তিনি। অর্থাৎ যাঁদের এখনও পরবার কাপড়-চোপড় নেই, যাঁদের সঞ্চয়ে এখনও খাবার লবণ ও চাল নেই, তাঁদের সুর-ই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। কবির জবানি থেকেই আমরা তা জানতে পারি,

> "আমার রচনার বেশিরভাগ পাত্র-পাত্রীরা অন্ত্যজ দলিত নিম্নবর্গীয় মানুষ, যেহেতু আমি সেই সমাজভুক্ত ফলে আমি তাদের প্রতিনিধিত্ব করেছি আমার রচনার পাত্র-পাত্রীদের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি গল্পেই আমি চিনি-লেবুর সরবতের মতো মিশে আছি, যা আমার ভালো লাগে, অন্যের তা ভালো নাও লাগতে পারে, কেননা রঙিন ড্রিঙ্কসের পাশে লেবু-চিনির সরবত অনেক ক্ষেত্রে ব্রাত্য হতে বাধ্য। নিজের আত্মজকে, রক্তকে মানুষ সব চাইতে বেশি ভালোবাসে। ফলে এটি কোন অপরাধ বা অহংকার নয়।"[১]

তাঁর এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে, ঘড়াই সাহিত্য নারীমনের ভাষ্যও। নারীর নারীত্ব, মূল্য ও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা, বিদ্রোহী চেতনা তাঁর কথা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিমাণে প্রতিফলিত।

প্রথমেই আমরা যদি ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই-এর 'নুনবাড়ি' উপন্যাসের প্রতিবেদনে দৃকপাত করি তাহলে দেখতে পাব, আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা লবঙ্গ বিদ্রোহের দীপ্তিতে উজ্জ্বল-ভাস্বর। লবঙ্গর পিতা জটায়ু একমাত্র মেয়ের বিবাহের সময় পণ হিসেবে জামাইকে একটা বাইক কিনে দেবার কথা বলেছিল। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন সংসারের মানুষ জটায়ু মেয়ের বিয়ের সাত বছর পরেও সেকথা রাখতে পারেনি; কিনে দিতে পারেনি মোটরসাইকেল। ঝামেলার সূত্রপাত এখান থেকেই। পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হতে দেখি লবঙ্গকে। লবঙ্গ যে কাঠের পুতুল নয়, মন বলে লবঙ্গর যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষেত্র আছে স্বামী কালাচাঁদ তা মানতে চাইত না। এমনকি লবঙ্গকে স্ত্রীর যথাযোগ্য মর্যাদাও দিতে চাইত না। উল্টে নানান অজুহাত দেখিয়ে লবঙ্গর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাত,

> "খাওয়ার সময় কালাচাঁদ চুলের মুঠি ধরে দরজার কাঠে ঠুকে দিল মাথাটা। গাব ফলের মতো ফুলে গেল কপালটা। ছ্যাঁচা মাংস ছ্যাঁচা আদার রসের চেয়েও রস কাটল বিশ্রী। মুখে যা না আসে তাই শুনিয়ে খরাবেলায় গাল পাড়ল শাশুড়ি।"[২]

অধিকাংশ প্রান্তিক নারী যেখানে স্বামীর এই শারীরিক নির্যাতন মুখ বুজে মেনে নেয় সেখানে দাঁড়িয়ে লবঙ্গ প্রতিবাদ করে। স্বামী কালাচাঁদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য না করে সে পালিয়ে আসে পিতৃগৃহে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে লবণ উৎপাদন করে স্বনির্ভরতার পথে পা বাড়ায়,

> "এই নুনবাড়ির উপর তার যে মায়া–এ মায়া কেবল পেট পালার জন্য নয়। এর প্রতি এক ধরনের সুপ্ত ভালবাসায় মন ডুবে আছে তার। রাতে শুয়েও তো সে এই নুনবাড়ির স্বপ্ন দেখে, শিহরিত, পুলকিত হয়।"[৩]

স্বামীবিচ্ছেদ তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করে না, বরং অতীত ভুলে জীবনকে আবার নতুনভাবে সাজানোর সংকল্পে সে একজন দৃঢ়চেতা নারী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে নারীমুক্তির কেন্দ্রবিন্দু, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই আলোচ্য উপন্যাসের পাতায়।

উপন্যাসের কাহিনি যতই এগিয়ে যায় ততই আমরা দেখি অনিল ঘড়াই নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে শুরু করেছেন। তাই তো আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, স্বামী কালাচাঁদের দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদে লবঙ্গ খুব একটা বিচলিত হয়নি। বরং তাঁর সামনে প্রসারিত হয়েছে মুক্তির পথ। গঞ্জের পয়সাওয়ালা নারীকে বিয়ে করে কালাচাঁদ অন্যভাবে বেঁচে আছে। তার মনে এখন কোনও অশান্তি বা গ্লানি নেই। স্বামী কালাচাঁদ যদি অন্যভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে তাঁরই বা নতুন করে বেঁচে উঠতে দোষ কোথায়? লবঙ্গর মনে জায়গা করে নিয়েছে এই ভাবনা। আসলে লবঙ্গর ন্যায়দণ্ড ঋজু, পুরুষশাসিত সমাজের অসাম্যের প্রতি সে ক্রুদ্ধ এবং বংশপরম্পরাগত সংস্কারের প্রতি সে ধিক্কারে আপসহীন। সমাজে নারীভূষণ বলতে আমরা যা বুঝি, স্বামীর আনুগত্য, তিতিক্ষা, প্রশ্নাতীত অপত্যস্নেহ সবই ছোটো হয়ে গেছে তাঁর ন্যায়বোধের কাছে। ন্যায়ের

জন্য, সত্যের জন্য সে নিজের স্বামী-সংসার অবলীলায় পরিত্যাগ করেছে। এমনকি লবঙ্গর প্রতিবাদীসত্তা প্রশ্ন তুলেছে মানবজীবনের চিরাচরিত সম্পর্কের প্রতি। শুধু তাই নয়, নারীজীবনে এই সম্পর্কগুলির অবস্থান এবং প্রভাবের সে মূল্যায়নও করতে চায়। তাই তাঁর মন বলে ওঠে,

> "পুরুষের দ্বিতীয় নারী তৃতীয় নারী এমন কি একাধিক নারী যখন কোন নিন্দার নয়, তখন মেয়ে হয়ে দ্বিতীয় স্পর্শ, অন্য জীবন চাওয়াটা কি ভুল? এই প্রায় পুরুষ দলিত সমাজে পুরুষের পদস্খলন, স্বৈরাচার, অসংযম, স্বেচ্ছাচার, বিধ্বংসী জীবনযাপন যদি নির্বিবাদে সকলে মেনে নেয় তাহলে একটা অসহায় আত্মসমস্যা জর্জরিত মেয়ের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?"[৪]

তাঁর এই ভাবনাই তো তাঁকে পুরুষশাসিত সমাজের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত নানান রীতিনীতি, বিধি-নিষেধকে সে মেনে নিতে পারেনি। তার ফলে তাঁকে সমাজ প্রভুদের অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছে একথা সত্য, তবুও নিজের লক্ষ্যে সে অবিচল থেকেছে। তথাকথিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও সে বাল্যবন্ধু কণ্ঠিরামকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে। বন্ধু কণ্ঠিরামকে পাশে পেয়ে নুনবাণে নুনজল ফোটাতে গিয়ে যে পরিশ্রম হয় সেই পরিশ্রমকে পরিশ্রমই বলে মনে হয় না লবঙ্গর। আসলে জীবনের চরম সার্থকতা তো প্রেমের জাগরণেই। যতদিন না এই প্রেম জাগ্রত না হচ্ছে ততদিন মানুষ খণ্ডিত থাকে, সে নিজেকে পায় না সম্পূর্ণ করে। কিন্তু শরীর দেওয়া-নেওয়ার খেলায় লবঙ্গর অজান্তেই একসময় বাসা বাঁধে শিশুভ্রূণ। দুজনের ঐকান্তিক ইচ্ছায় আগত সেই নবভ্রূণকে লবঙ্গ অনাদরে ঝরিয়ে দিতে চায় না। সমাজের চোখে এই ভ্রূণ অবৈধ বলে তাঁর বান্ধবী অবলাকে একসময় লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচতে ভ্রূণ নষ্ট করতে হয়েছিল। কিন্তু লবঙ্গ সে পথে যেতে চায় না। কেননা এ নারী চিত্তবৃত্তিবর্জিত দেহসর্বস্ব তরুণী নয়, নবচেতনায় জাগ্রত নারী। আবার আত্মহত্যা তাঁর কাছে অতি নীচ কাজ। আত্মহত্যাকে সে ঘৃণা করে। তাঁর কাছে আত্মহত্যা অমানবিক। তাই সে মনে মনে আগত সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সে কণ্ঠিরামের কাছে যায় এবং জানায় সে অন্তঃসত্ত্বা। কণ্ঠিরাম একথা জানার পর লবঙ্গকে অপবাদ, গঞ্জনার হাত থেকে বাঁচাতে তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যেতে চেয়েছিল। সেখানে সে যাত্রার দলে বাঁশি বাজানোর কাজ করে লবঙ্গকে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। কেননা তাঁর মন বলে উঠেছে অপবাদ, লোকনিন্দার ভয়ে এক সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে আরেক সমাজে গিয়ে গেড়ে বসার মধ্যে কোনও বীরত্ব-মহত্ত্ব নেই। তাই কণ্ঠিরাম সাহসের ওপর ভর করে লবঙ্গকে সঙ্গে নিয়েই তাঁদের সমাজেই মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছে,

> "আগামী প্রজন্মের নুনবাড়িতে হাত রেখে কণ্ঠিরাম লবঙ্গের দিকে তাকায়। ...তার মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় নুনজল দিয়ে তৈরি হয়েছে এই দেহ, নারীদেহ। নোনাজলের নুনবাড়ি সুখবাড়ি।"[৫]

এভাবেই সকল বাধা-বিপত্তিকে পেছনে ফেলে লবঙ্গ-কণ্ঠিরাম একে অপরের হাত ধরে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে নুনমারা সম্প্রদায়ের জীবনভাষ্যের অন্তরালে এক প্রান্তিক নারীর স্বাধিকারের গল্প। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারীকে যে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করেই আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হয় তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও লবঙ্গ এ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই স্বামীর দুষ্কর্মের সে প্রতিবাদ করেছে। এমনকি পাতিব্রত্যকেও প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে প্রান্তিক নারীর প্রতিবাদী চেতনার প্রতিবেদন।

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সব শ্রেণির নারীরাই নিপীড়িত-নির্যাতিত। কিন্তু যাঁদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে তাঁরা আমাদের সমাজব্যবস্থায় দুইভাবে শোষিত হয়ে থাকে। প্রথমত, একজন নারী হিসেবে, দ্বিতীয়ত অন্তেবাসী-অন্ত্যজ হিসেবে। এই দ্বিবিধ শোষণের চাপ অধিকাংশ নারীর পক্ষেই বহন করার শক্তি থাকে না। হয় তাঁরা মুখ বুজে সব নির্যাতন সহ্য করে যায় আজীবন, নয়তো আত্মহত্যার মতো নীচ পথকে বেছে নিয়ে জীবনযুদ্ধে ইতি টানে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'মুকুলের গন্ধ' উপন্যাসের অন্যতম নারীচরিত্র যশোদার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। তাঁর জন্ম বর্ণবিভাজিত সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে। হাড়ি জাতির নারী হয়েও সে আত্মস্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল।

যশোদার হাড়ি পাড়ায় ঘর। সে রূপবতী-সুন্দরী। তাঁর স্বামী সুবল হাজরা একজন কর্মঠ-পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। আমের সিজিনে আমবাগান কিনে নিতেন বাবুদের থেকে। আমের ব্যবসা করে সে সুখী রেখেছিল স্ত্রী যশোদাকে। কেননা

যশোদা অল্পেতেই খুশি। ছোট্ট সংসার তাঁদের ভালোই চলছিল। কিন্তু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে অসময়ে সুবল হাজরার মৃত্যু হলে অভাব তাঁর জীবনে আঘাত হানে। আর ঠিক তখনই আমাদের সমাজব্যবস্থার নগ্নদিক উন্মোচিত হয়ে যায়। গ্রাম্য সমাজের হর্তাকর্তারা এক অসহায় নারীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে ভোগের নেশায় ছুটে আসে। গ্রামের অনেকেই টাকার লোভ দেখিয়ে তাঁর শরীর নিয়ে খেলা করতে চাইত। কিন্তু নিদারুণ অভাবের মধ্যে দিন কাটলেও পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। পুরুষের কামুক চোখকে উপেক্ষা করে সে গ্রাম-সমাজে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যায়,

> "যশোদা মাসী একবেলা রেঁধে দু'বেলা খায়। যেদিন হাঁড়ি চড়ে না, উনুন জ্বলে না সেদিনও তার মুখের হাসি মেলায় না। তার একমাত্র ছেলে রাখাল, সে-ও এই বয়সে মায়ের স্বভাবটা পেয়েছে। দুটোখানি শুকনো মুড়ি পেলে সে ভুল করেও ভাতের নাম মুখে আনবে না। ভাত এই খরার মরশুমে তাদের কাছে স্বপ্নের জিনিস। একটা নতুন পিরাণ-প্যান্টলুন রাখাল কত দিন পরেনি।"[৬]

অভাবের জাঁতাকলে পড়ে সে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েনি। গ্রামে কাজের অভাব থাকায় বন-জঙ্গল-পুকুর থেকে সে শাকসবজি তুলে এনে সন্তানের দু-বেলা, দু-মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করেছে। তবুও বিত্তবানদের দরজায় গিয়ে ঠোকা মারেনি। অন্যদিকে সমাজের প্রতাপবর্গ তাঁর মতো অন্ত্যজ-অবহেলিত নারীর দু-বেলা দু-মুঠো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার কোনও ব্যবস্থা করতেই পারেনি। উল্টে কু-ইঙ্গিত করেছে –

> "অমন ধার বঁটির মত চেহারা, হাত বাড়ালেই নোট উড়ে এসে হাতে পড়বে।"[৭]

পচনশীল এই সমাজের থেকে যশোদার আর কিছুই চাওয়ার নেই। যতদিন শরীরে বল আছে ততদিন সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে এমন দৃঢ়চেতা নারী সে। মাঝে মাঝে সমাজের কামুক পুরুষের জন্য তাঁকে ভীতু-সঙ্গীহীন ডাহুকীর মতো বেঁচে থাকতে হয়। সহায়-সম্বলহীন নারীর কাছে এ যাতনা অসহনীয়। তবুও সে বুকে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে প্রাণপণে বেঁচে ছিল। আর্থিক দিক থেকে সহায়-সম্বলহীন হয়েও যশোদা কিন্তু পরনির্ভর নয়। পরিচারিকার কাজ করে সে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এখানে সে আত্মমর্যাদাবোধে পূর্ণ এক নারী।

যশোদা সন্তানের মুখে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত তুলে দেবার জন্য একটি মেসে রাঁধা-বাড়ার কাজ করত। কিন্তু সেখানেও আমরা দেখি, কামুক পুরুষের হাত থেকে তাঁর রেহাই নেই। ইতিহাসের মাস্টারমশায় তাঁকে সুযোগ পেলেই জ্বালাত। আসলে এসবের মূলে আমাদের সমাজে যে ধারণাটি সক্রিয় ছিল তা হল নারী ব্যক্তি নয়, পণ্য। তা কেমন পণ্য? ভোগ্যপণ্য। তাই তো আমাদের নজরে পড়ে, একদিন ইতিহাসের মাস্টার ফাঁকা মেসে যশোদাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল,

> "তুমি আমার নুরজাহান। এই নাও রাখালের মা দশ টাকা। ময়রা দোকান থেকে পানতুয়া কিনে খেও। আমি যে তোমাকে ছুঁয়ে দিয়েছি এ কথা কেউ যেন না জানে।"[৮]

একজন শিক্ষিত মানুষের এহেন আচরণ সত্যিই লজ্জার। কিন্তু পেটের ভাতের জন্য পেটের ভেতর রাখালের ভাই নড়ুক এটা যশোদা চায়নি বলেই কাজটি ছেড়ে দিয়েছিল অসময়ে। এ নারী শক্তিমতী। এ নারী বিপৎসংকুল পরিস্থিতিতে অশ্রুপাত করে না, অন্যায়ের সামনে জ্বলে ওঠে। কিন্তু অভাবের বিষদাঁত তো তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে মারে। এই মারের যাতনা সহ্য করতে না পেরে একসময় গ্রামের বিত্তবান মানুষ কুঞ্জবাবুর মেয়ের বিয়েতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে এঁটো পাতা ফেলতে যায় যশোদা। কিন্তু হারিয়ে আসে নিজের এতদিনের সযত্নে রাখা সতীত্ব,

> "বাঁশবনে সর্বস্ব খোয়া গেল যশোদার। বাধা দেওয়ার সামান্যতম সুযোগটুকুও সে পেল না। বাবুরা তাকে নিমেষের মধ্যে বিবস্ত্র করে টেনে নিয়ে গেল খাদটায়। জ্ঞান হারাবার আগে ময়ূর ছাড়া কার্তিকের পা'টা চেপে ধরেছিল যশোদা, কঁকিয়ে উঠে বলেছিল, অনেক তো হ'ল বাবুগো, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমার রাখালটা গোয়ালঘরে একলা আছে। কেউ তার কথা শুনল না। বাঁশপাতার বিছানায় তিনজন শহুরে বাঘ কামড়ে ছিঁড়ে খেল যশোদার দেহ। হাত-পা এলিয়ে ক্ষত জরায়ু নিয়ে সারারাত সংজ্ঞাহীন শুয়ে থাকল যশোদা। যাওয়ার সময় বাবুরা তার নগ্ন দেহ-সুষমায় কাপড়টা পর্যন্ত ঢেকে যায়নি।"[৯]

যার যায় সে-ই তো কেবল বোঝে কী গেল তার। অন্যরা তো ডুগডুগি বাজায়, মজা লোটে। যশোদার যা গিয়েছে তা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না এটা আমরা জানি। একজন বিধবার ধর্ম গেল। গ্রামসমাজে বিচারসভা বসল। কুঞ্জবাবু গ্রামের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 196 - 203
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অবস্থাবান মানুষ। সে নিজের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, 'নারী ভোগ্যপণ্য' এই মতাদর্শের ধারক ও বাহক সে। তাই এত বড় অঘটন তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি; বিচলিত করেছে পঞ্চায়েত ভোটে জেতার ভাবনা,

> "সামনে পঞ্চায়েত ভোট। আমি ক্যানডিডেট। যেন-তেন-প্রকারেণ জিততে আমাকে হবেই। কেসটা মিটিয়ে দিন। আমি আপনাকে খুশি করে দেব।"[১০]

এভাবেই যুগ যুগ ধরে নারী আধিপত্যবাদী প্রতাপবর্গের দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। নারীমাংসলোলুপ পুরুষ আজও ব্যাধের ভূমিকায় আর নারী ভীতা হরিণী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর সমস্ত পরিসর ও অবকাশ আজও রুদ্ধ। তবুও নিজের পীড়নের পাঠকৃতি গড়তে চায় নারী। যশোদাও নিজের প্রতিবাদের ভাষা গড়ে নিয়েছে; রুদ্ধ আয়তনে অন্তর্ঘাত করে,

> "রক্তের দাম, ইজ্জোতের দাম আড়াইশ টাকা? টাকাটা হাতে নিয়ে দল্লা পাকিয়ে থু-থু করে ছুঁড়ে দেয় যশোদা! ডাক্তারবাবুর অবাক করা চোখ। হেঁট হয়ে সেই দলা পাকানো টাকাটা তুলে নিয়ে কুঞ্জবাবু সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসেন ফিমেল ওয়ার্ড থেকে।"[১১]

যশোদা মাথানত না করে এভাবেই পুরুষতন্ত্রের একবাচনিক জগতে অন্তর্ঘাত করেছে। অন্তেবাসী নারী যশোদা এভাবেই প্রতাপের, আধিপত্যবাদীর যুক্তি-শৃঙ্খলকে পরাভূত করার কৃৎকৌশল গ্রহণ করেছে। কুঞ্জবাবুর থেকে টাকাটা নিলেও হয়তো তাঁর সংসারের দৈন্যদশা কিছুটা ঘুচত, কিন্তু যশোদা সেদিকে পা বাড়ায়নি। সবকিছু ছেড়ে সে কন্টকময় পথ বেঁছে নেয়। যশোদার বিদ্রোহীসত্তা এখানেই লুক্কায়িত।

'মুকুলের গন্ধ' উপন্যাসের প্রতিবেদনে আরও একজন নারী অনমনীয় দৃঢ়তায় প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সে হল টিয়া। টিয়াও হল সেই নারী যে পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ, দাপটকে ভেঙে নারীচেতনাকে উপন্যাসের প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। টিয়া যখন সাত বছরের মেয়ে তখন তাঁর মা পেটের অসুখে মারা যায়। তারপর থেকে শুরু হয় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে টিয়ার অবিরাম লড়াই। এই লড়াইয়ে সে একজন অক্লান্ত পথিক। পরিবারের দরিদ্র্যতা তাঁর সুন্দর মুখাবয়বে দুশ্চিন্তার কালিলেপনেও অক্ষম।

অভাব-অনটন শুধু দেহ নয়, মানুষের মনটাকেও কুঁকড়ে দেয়। ভেঙে দেয় মেরুদণ্ড, বেঁচে থাকার যাবতীয় উদ্যম-উৎসাহ। বিপথে চালিত করে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীকেও। কিন্তু টিয়া সে পথের পথিক নয়। তাঁর পিতা ভজহরি হাসপাতালের জিডিএ। স্ত্রীর অকালমৃত্যুর পর সে আবার বিবাহ করে কাননকে। প্রথম পক্ষের মেয়ে টিয়া ও তাঁর দাদা ভজন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কানন ও তার চারটি বাচ্চাসহ মোট আটজন মানুষ ভজহরির সংসারে বিরাজমান। তাঁর ক্ষীণ আয়ে এই আট প্রাণীর সংসার চলত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সংসারের এই হাল দেখে টিয়া সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেনি; নেমে পড়ে পিতার সঙ্গে নিজেও সংসারের হাল ধরতে। টিয়া দিনরাত ঘরসংসার সামলায়। শুধু তাই নয়, গ্রামের ডাক্তারবাবু ইংরেজি কাগজ নিত। টিয়ার বাবা স্বল্প দামে কিনে নিত সেই কাগজ। অতঃপর টিয়া দক্ষ হাতে সেই কাগজ দিয়ে ঠোঙা বানাত। এভাবেই সে নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে।

ভজহরি সংসারের কথা ভেবে হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ছাড়াও দুঃস্থ-অভাবী মানুষদের হাসপাতাল থেকে যে খিচুড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয় তা রান্নার কাজে হাত লাগায়। বয়স্ক পিতা একা হাতে সব কাজ সামাল দিতে পারবে না জেনে টিয়া পিতার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। টিয়া জল তোলা থেকে শুরু করে জ্বাল দেবার কাঠ পর্যন্ত ঠেলে দেয় বড় বড় চুলাতে। এমনকি খিচুড়ি বিতরণের সময়ও হাসপাতালের স্টাফদের সাহায্য করে। এত কিছুর পরেও সৎমার কাছে তাঁর কোনও মূল্য নেই। উলটে তাঁকে সহ্য করতে হয় বিষমাখানো কথার তীর, শারীরিক যাতনা,

> "টিয়া যতদূর পারে করে, না পারলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। আর বসে থাকলেই হাড় মাস জ্বলে সৎমায়ের। খাওয়ার খোটা দেয়। চুলের মুঠি ধরে শাসন করে, মুখে যা না আসে তাই বলে পাড়া শুনিয়ে গাল দেয়।"[১২]

এসব শুনে মনটা তাঁর অস্থির হয়ে ওঠে। কিছু করে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে তাঁর মন চায়। তখন সে ঘরে বসে না থেকে দুপুরের তপ্ত রোদকে উপেক্ষা করে মাঠে মাঠে গিয়ে গোবর কুড়ায়, ঘষি দেয়, শুকনো ডাল ভেঙে আনে জ্বালানির খরচ বাঁচানোর জন্য। এতৎসত্ত্বেও সে তাঁর সৎমায়ের মন জয় করতে অপারগ। আসলে তাঁর সৎমা চায় অন্যকিছু।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 196 - 203
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সে তাকে গ্রামের বিত্তবান মানুষ কারখানাবাবুর ঘরে গিয়ে রাত কাটাতে বলে। পাপের পথে নামতে বলে। কেননা সেখানে টাকা বেশি। কিন্তু একরাশ ঘৃণার সঙ্গে টিয়া সৎমায়ের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে,

> "আমার দ্বারা ওসব কাজ হবেনি মা। আমি না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু কারখানাবাবুর ঘরে গিয়ে রাত কাটাতে পারব না।"[১৩]

সবাই ভাবে টিয়া হচ্ছে বনের টিয়া। পোষ মানালে পোষ মানবে। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বময়ী নারী টিয়া প্রতিবাদের মাধ্যমে এই একবাচনিকতাকে অস্বীকার করে বহুস্বরের পতাকা উড়িয়েছেন।

পিতা ভজহরির জীবিত অবস্থায় তাঁদের সংসার কোনো রকমে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মারা যাবার পর অভাব সজোরে থাবা মারে তাঁদের সংসারে। পিতা ভজহরির জীবিত অবস্থায় যে সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলত, মৃত্যুর পরে তা মুখ থুবড়ে পড়ে। এই থুবড়ে পড়া সংসারকে ডাঙায় তুলে আনার জন্য টিয়ার সৎমা বাধ্য হয়ে একসময় অসৎ পথ অবলম্বন করে। কারখানাবাবুর কাছে নিজের পুষ্পিত শরীরকে মেলে ধরে এবং টিয়াকেও এই পথে আনার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। কিন্তু টিয়ার অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে ওঠে। নারী কি ভোগ্যপণ্য যে সহজেই নিজেকে অর্থের কাছে বিক্রি করে দেবে? টিয়ার কাছে তা আদৌ নয়। এদিকে টিয়াকে অর্থের বিনিময়ে শয্যাসঙ্গী করতে না পেরে একসময় সুযোগ বুঝে বাপের বয়সী কারখানাবাবু তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে। কিন্তু বুদ্ধিমতী টিয়া সেই জাল ছিন্ন করে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে,

> "মাঝ রাতে লাথ মেরে কারখানাবাবুকে সরিয়ে দিয়েছে টিয়া। আশ্চর্য, মানুষটা এক ফোঁটা রাগেনি, মার খাওয়া ভেড়ার মত ঘাড় নিচু করে চলে গেল। সেদিন থেকে চাল কেনার টাকা নেই।"[১৪]

অভাবের ছোবল টিয়াকে অহরহ দংশন করে ঠিকই, কিন্তু পাপ-অন্যায়-অনাচারকে সে দু-হাত দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এভাবেই প্রতিবাদিনী নারী টিয়া ধাপে ধাপে নিজের স্বতন্ত্র স্বরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য পুরুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে; বিরূপ বিশ্বে নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে চেয়েছে। টিয়ার কার্যকলাপই আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেইসব নারীর কথা, যাঁদের কাছে অর্থ নয়, মানসম্মানই অনেক বড়। সর্বোপরি, টিয়া চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এক প্রান্তিক নারী চরিত্রের দৃঢ়তা, স্বাধীনচেতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

'পিয়াসহরণ' উপন্যাসের মাধুরী হল ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই সৃষ্ট আরও একজন তেজস্বিনী-প্রতিবাদিনী নারীচরিত্র। মাধুরী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অনিল ঘড়াই এক প্রান্তিক নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি আমাদের শুনিয়েছেন। সেসঙ্গে মাধুরীর স্বাধীন ও মুক্ত ভাবনার জয়গান গেয়েছেন। নিষ্ঠুর-হৃদয়হীন শ্বশুরকর্তৃক নির্যাতিত হতে হতে এক বাঙালি বধূ কীভাবে আপন বুদ্ধিমত্তায় সেই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এল এবং নিজেকে একজন বীরাঙ্গনা নারী হিসেবে আমাদের সামনে মেলে ধরল তারই আখ্যান 'পিয়াসহরণ' উপন্যাস।

মাধুরীর বিয়ে হয় পবিত্রর সঙ্গে। কর্মসূত্রে পবিত্রকে বছরের অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। ফলে মাধুরীকে একা পড়ে থাকতে হয় শ্বশুরবাড়িতে। আর যে কয়েকদিন স্বামী ছুটি নিয়ে বাড়ি আসে সে কয়েকদিন শ্বশুর কুণ্ডুবাবু তাদের মেলামেশায় নানা বাধা সৃষ্টি করে। পবিত্রকে সে কিছুতেই মাধুরীর সঙ্গে মিশতে দেয় না। বর্তমানে পবিত্রর পোস্টিং রাজস্থানের উদয়পুরে। পবিত্রর ইচ্ছা ছিল সঙ্গে স্ত্রী মাধুরীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু কুণ্ডুবাবুর অমত থাকায় তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এহেন অবস্থায় বুকভর্তি ক্ষোভ-জ্বালা নিয়ে সে কর্মস্থলে চলে যায়। সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মাঝমধ্যেই বাড়ির ল্যান্ডফোনে সে ফোন করে স্ত্রী কাবেরীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করত। মাধুরী তার ডাকে সাড়া দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে কুণ্ডুবাবু ভীষণ রেগে যেতেন। বউমাকে ধমক দিয়ে বলতেন, ছেলেটাকে ভালোভাবে চাকরি করতে দাও।

গুরুজনের এধরনের ব্যবহার মাধুরীকে বিস্মিত করে। আসলে কুণ্ডুবাবু চায় মাধুরীর পুষ্পিত দেহের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীও বুঝে যায় তাঁর শ্বশুর একজন গ্রাম-সমাজের ভদ্রবেশী শয়তান। গায়ে মানুষের চামড়া থাকলেও সে পশুর চাইতেও অধম। এটা জেনে যাওয়ার পর মাধুরীর কাছে সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। এমনকি কুণ্ডুবাবুর অত্যাচারে তাঁর ঠোঁটের হাসি পর্যন্ত হারিয়ে যায়। বিয়ের পর সে একবারও বাপের বাড়ি যেতে পারেনি। যাওয়ার ইচ্ছে যে প্রকাশ করেনি তা নয়। আসলে ভণ্ড শ্বশুর-ই তাকে যেতে দেয়নি। শুধু বাপের বাড়ি নয়, মাধুরীর বাজারে-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 24
Website: https://tirj.org.in, Page No. 196 - 203
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মন্দিরে যাওয়া, নিকট আত্মীয়র সঙ্গে কথা বলার যাবতীয় স্বাধীনতাও কেড়ে নেয় তাঁর শ্বশুর। এমনকি পিতৃগৃহ থেকে মাধুরীকে কেউ দেখতে এলে তাকে ঘরেই ঢুকতে দেন না কুণ্ডুমশাই। দোকানে চা খাইয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় দেন।

এহেন অবস্থায় মাধুরী যেন ফাঁসে লটকে যাওয়া ডাহুক পাখি। দিন-রাত্রি সে মনে মনে কাঁদে। এমন দমবন্ধ গুমোট পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে ছটপট করে, কিন্তু পারে না। যেখানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার স্বাধীনতা নেই সেখানে কেউ-ই হেসেখেলে বাঁচতে পারে না। মাধুরী কতদিন দেখেছে তাঁর শ্বশুর কুণ্ডুবাবু তাঁর ঘরের জানালায় এসে হা-করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। বয়স্ক মানুষের চোখের এ ক্ষুধা মাধুরীর মনে ভীতির সঞ্চার করে। তখন আতঙ্কিত, শিহরিত মাধুরী ভয়ে ভয়ে দিন কাটায় তাঁর শ্বশুরঘরে। একদিন পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কানের একটি দুল হারিয়ে ফেলে মাধুরী। তা নিয়েও তাঁকে অনেক কথা শুনতে হয়। এমনকি সে যখন বাবা বলে ক্ষমা চাইতে যায় তখন কুণ্ডুবাবু যা বলে তাতেই আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সে মাধুরীকে বউমা হিসেবে দেখে না, একজন রাঢ় হিসেবে দেখে। সে মাধুরীকে বলে, খবরদার বাবা বলবে না। তুমি আমার মেয়ে নও, বউমা। মনে রেখো বউমা আর ঔরসজাত মেয়ে এক নয়। আমি মহাপুরুষ নই, রক্ত মাংসের মানুষ। মাথায় রাগ চড়ে গেলে সেদিন কিন্তু পার পাবে না।

পার পায়নিও। দুল হারিয়ে দেওয়ার পর কুণ্ডুবাবু আরও নির্মম হয়ে ওঠে। স্বামীর সঙ্গে মাধুরীর কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। কুণ্ডুবাবুর এই পৈশাচিক আচরণের কথা একটি চিঠিতে লিখে সেই চিঠি কাবেরী বাড়ির কাজের মেয়ে মন্টুর মায়ের হাত দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কেননা কুণ্ডুবাবু মিষ্টি কথায় মানুষের মন ভুলিয়ে সাদাকে কালো বানিয়ে চালিয়ে নিতে পারে অনায়াসে। অন্যদিকে ঘরের কথা বাইরে বের হবার জন্য মাধুরীকে সহ্য করতে হয় অসহ্য যাতনা। রাতভর কুণ্ডুবাবুর লাথি-থাপ্পড় খেয়ে বিছানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাধুরী। এমনকি মাধুরীর চুল ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয় কুণ্ডুবাবু। শুধু তাই নয়,

> "ঘুমের ঘোরে সে দেখল কুণ্ডুমশাই ধুতি খুলে শুধু আন্ডার প্যান্ট পরে তার উপরে চড়ে বসেছেন। ঘুম জড়ানো চেহারায় মাধুরী ভাবছিল এখন তার কী করণীয়। মাথায় কোনো বুদ্ধি খেলছিল না। কুণ্ডুবাবু তার বুকের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দুদিনের না কাটা দাড়ি ঘষছিল। পাকা দাড়ির খোঁচায় রি-রি করে জ্বলছিল মাধুরীর শরীর। কোনও উপায় না দেখে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে কুণ্ডুমশাইয়ের নিম্নভাগে সজোরে লাথি কষিয়ে দিল। তারপর এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের শেকল তুলে দিল সে। সেখান থেকে মাধুরী এলোমেলো শাড়িতে ছুটে গেল ভাঁড়ার ঘরে। ধানে দেওয়ার বিষ ডাব্বাটা হাতে নিয়ে জ্যোৎস্না রাতে চলে এল পুকুর পাড়ে। সে মরবে, নিজের ইজ্জত খোয়ানোর আগেই সে মরবে।"[১৫]

শ্বশুর তাঁর সর্বস্ব লুটে নিতে চাইলে কাবেরী সে জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসে আপন বুদ্ধিমত্তায়। একসময় তাঁর অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তা কঠিন প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই দুশ্চরিত্র-হৃদয়হীন শ্বশুরের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে। তাঁর মনে শ্বশুরের যে আদর্শ মূর্তি আজন্ম সংস্কারের ফলে গড়ে উঠেছিল সেটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ফলে আত্মহত্যার বাসনাকে দূরে সরিয়ে রেখে যে রাতে কুণ্ডুবাবু তাঁর সর্বস্ব হরণ করতে গিয়েছিল সেই রাতেই সে বড় শাবল দিয়ে কুণ্ডুবাবুর হাঁটুর উপর সজোরে আঘাত করে। আর এই শাবলের আঘাতে হাঁটুর চাকতি এবং হাড় চুনাপাথরের ঢেলার মতো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। মানবরূপী পশুর সঙ্গে মাধুরীর এমন আচরণ আমাদের মনে স্বস্তি দিয়ে যায়। নারী শুধু গৃহের লক্ষ্মী নয়; প্রয়োজনে তাঁরা যে কালীর মতো রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে পারে তার প্রমাণ মাধুরী। প্রতিবাদী নারীর প্রতিবাদের অস্ত্রও নারীবিশেষে পৃথক পৃথক। পারিবারিক প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই যখন নারীস্বাধীনতা বিরোধী তখন প্রতিবাদ, একমাত্র প্রতিবাদই নারীকে তাঁর হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারে। মাধুরীও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রতিবেদনে সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মাধুরীর এহেন প্রতিবাদ আমাদের সমাজে এতদিন ধরে প্রচলিত 'গুরুজনদের প্রতি অন্ধ কর্তব্যবোধ' নামক বুলিকেই প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এতে তাঁর ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে আরও প্রভাময়ী।

পরিশেষে বলা যায় যে, অন্তেবাসী নারীরা যখন পিতৃতন্ত্রের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় তখন তাঁরা কেবলমাত্র সমাজে প্রচলিত কিছু কিছু মতাদর্শকেই ধ্বংস করে না, তাঁরা আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিতকেই নড়িয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। কেননা তা নারীস্বাধীনতা বিরোধী,

> "When marginalized women want to escape from Exploitation they do not simply destroy a few prejudices' that upset the whole set of dominant values-economic, social, moral, sexual. They chal- lenge every theory, every thought, every existing language in that these are monpolised by men only. They question the very foundation of our social and cultural order, the organisation of which has been prescribed by the patriarchal system."[১৬]

আমাদের আলোচ্য নারী চরিত্ররাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নীতি-নির্দেশকে মান্যতা না দিয়ে বিদ্রোহের মশালটিকে প্রজ্বলিত রেখেছে এবং পিতৃতন্ত্র নারীশোষণের যে দপ্তরখানা খুলে রেখেছে পৃথিবীতে সেখানে কামান দাগিয়েছে। 'নুনবাড়ি' উপন্যাসের লবঙ্গ, 'মুকুলের গন্ধ' উপন্যাসের যশোদা, টিয়া, 'পিয়াসহরণ' উপন্যাসের মাধুরী পিতৃতন্ত্রের ফাঁদে পড়ে সাময়িকভাবে নিষ্পেষিত-নিগৃহীত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিজীবন বিদ্রোহের দীপ্তিতে উজ্জ্বল-ভাস্বর। যাঁদের পেটে দু-বেলা দু-মুঠো ঠিকমতো খাবার জোটে না তাঁরা যখন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় বই-কি!

Reference:

১. পাল, শ্রাবণী (সং.), পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা (১৯৭৭-২০০৭), কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০১১, পৃ. ৭৯
২. ঘড়াই, অনিল, নুনবাড়ি, মেদিনীপুর : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৯, পৃ. ১
৩. তদেব, পৃ. ৫৬
৪. তদেব, পৃ. ৭৭
৫. তদেব, পৃ. ৮৩
৬. ঘড়াই, অনিল, মুকুলের গন্ধ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৭০
৭. তদেব, পৃ. ১২০
৮. তদেব, পৃ. ৩০২
৯. তদেব, পৃ. ৩০৮
১০. তদেব, পৃ. ৩১২
১১. তদেব, পৃ. ৩১৩
১২. তদেব, পৃ. ৮০
১৩. তদেব, পৃ. ৮১
১৪. তদেব, পৃ. ২৯৩
১৫. ঘড়াই, অনিল, পিয়াসহরণ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৩৫
১৬. Williams, Raymond. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1977, P. 68